সাদা কাগজে কালো দাগ, কঙ্গোর কালো কবিদের কবিতা Tam-Tam **-এ**

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

'গিনিয়া (Guinea)-র উপসাগরে প্রথম যে সমুদ্র -জাহাজে নাবিকদের দল ইউরোপ থেকে এসে আফ্রিকায় উপস্থিত হয়েছিল, সেই সব জাহাজের ক্যাপ্টেনরা সেদিন এক মহাবিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। চারিদিকে তাকালেই দেখা যাচ্ছিল শুধু এক সুচিন্তিত রাস্তাঘাট, মাইলের পর মাইল সাজানো গাছের সারি আর সারি..., দক্ষিণে কঙ্গো সাম্রাজ্য, সর্বত্র জনারণ্য, ভাল ভাল সুন্দর কোমল সিল্কের জামাকারড় পড়া নর-নারী, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাজান এক শৃঙ্খলার পরিবেশ; (কোথাও ছিল না। সেই দৃশ্য, যে দৃশ্য বিশ্বকবির ভাষায় বলা যেতে পারত— ''এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে'', লেখক', আর সেই রাষ্ট্র সর্বত্র ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, ক্ষমতাসম্পন্ন সব রাষ্ট্রনেতা, শিল্পে ভরা চারিদিক, আর সেই সাথে হাড়ে হাড়ে জাতীয় সংস্কৃতির এক বহমান স্রোত...।"

সেইসময় অর্থাৎ পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর নাবিকদের এইসব বিস্তারিত বিবৃতি থেকে এটাই স্পষ্ট রূপে দেখা দিল, কোমরে যেখানে সাহারা মরুভূমির বেল্ট, সূর্যের ভয়ঙ্কর আলোর আলোয় যার নিচের রাষ্ট্রগুলি ছিল উজ্জ্বল, —যেখানে বলা হলো 'নিগ্রো আফ্রিকা'— যার ধন মান সৌন্দর্যে ছিল এক নিরবিচ্ছিন্ন 'হারমোনি'। (সেদিন ছিল না সেখানে কোনো ''উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগ'' বা ''বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায় কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে'' -র প্রশ্ন।) হায় তবু এক নতুন দুর্ভাগ্য শুরু হল। শুরু হল মানব রপ্তানির বাণিজ্য। আমেরিকার প্রয়োজনে অনেক অনেক কর্মী-ক্রীতদাস। শুরু হল ''লাইবেরিয়া'' (উত্তর পশ্চিম আফ্রিকা) থেকে আমেরিকার জন্য মানুষ চালান দেবার ব্যবস্থা, ও ব্যবসা। (এখানে বলে রাখা ভাল— 'এল মানুষ ধরার দল') কথাটাও ঠিক এখানে খাটে না এই জন্য যে, এর বহু পূর্ব থেকেই আমেরিকার দিকে আঙুল না তুলে দেখানো যায়, এরই বিপরীত অন্য এক ছবি। এদেরই প্রতিবেশী আরব দেশগুলি থেকে আরম্ভ করে সেই সুদূর তুর্কি সাম্রাজ্য পর্যন্ত আফ্রিকার কালো মানুষের দলকে ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহার করার জন্য গোপনে সেই মানুষ পাচারের বাণিজ্যই চলে আসছিল। তাই কবির নিজের ভাষাতেই এখানে আবার বলা চলে—''যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।'' আর এটাও তো সত্য, —পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদ তখন কোথায় না কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিল? চিন, ইন্দোচীন, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা— সারা পৃথিবী জুড়েই তো ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের জয়জয়কার। চিনে নিজের দেশেই জাপানীদের অত্যাচারে কতো শত শত চিনাদের মাথা না কেটে দিতে হয়েছে। আবার আরও আধুনিককালে, আমরা দেখতে পেলাম — 'Old wine in new bottle' প্রায় একই রকমের অন্য এক মানুষ পাচারের দৃশ্য। যার সূত্রপাত ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে। পশ্চিম জার্মানিতে হঠাৎ করে এত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়ে পড়ল, যে তখন আমরা চোখের সামনে দেখতে পেলাম রাতারাতি লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত তুর্কিদের তুরস্ক দেশ থেকে [জার্মান সরকার তুর্কী সরকারের সাথে চুক্তি করে] পশ্চিম বার্লিন তথা পশ্চিম জার্মানিতে তুলে এনে তুর্কী জনারণ্যে ভরিয়ে ফেললো। আমেরিকাতে আজ 'ব্ল্যাক'দের যে অবস্থা জার্মানিতে তুর্কীদেরও প্রায় সেই অবস্থাই দেখা দিল। অর্থাৎ মানব-চালান-বাণিজ্য যুগ যুগ ধরেই পৃথিবীর ইতিহাসে চলে এসেছে। তা বলে আমাদের অজ্ঞানতার বলি হিসাবে শুধু একটা বিশেষ মহাদেশের পরিচয় সেদিন পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির কলমে মানবতার ডাকের বিনিময়ে এমন একটা বিরূপ অসত্য একপেশে বক্তব্যের ছবির অবতারণা বাঞ্ছনীয় ছিল না। 'ক্ষমা করো' আফ্রিকার দুর্দশা নিয়ে তৃতীয় কোনও পক্ষ কেউ কারও কাছে ক্ষমা চায় — এই ভিক্ষাপাত্র হাতে নিতে কোনো আফ্রিকানই রাজী হবে না। আজ আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা আদায় করে নিয়েছে তাদের নিজেদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই। ঋণ থাকলে, শুধু পশ্চিমের গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের কাছেই থাকা উচিত। শোষণ করলেও বাঁচিয়েছে আবার তারাই। সেখান গান্ধীজির আন্দোলনের ঘটনাটুকু বাদ দিলে দেখা যাবে— সারা আফ্রিকা জুড়ে ভারতীয়েরা শুধু ব্যবসাই করে গেছে, আফ্রিকানদের শোষণ করে গেছে। যে কারণে আফ্রিকানরা ভারতীয়দের খুব একটা ভাল চোখে আজও দেখে না। কোনো ভারতীয়ের মানবতার ডাকে তাদের কিছু আসে যায় না। এবার তাঁর গবেষণা গ্রন্থে আফ্রিকা বিশেষজ্ঞ লিও ফ্রোবেনিউয়াস (Leo Frobenius) নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন, তাদের সংস্কৃতি যে ছিল এক অতি উচ্চমানের সংস্কৃতি —'AFRIKANISCHEN HOCHKULTUREN'. দৃষ্টান্ত : 'বেনিন' (Benin) -এর খনন কার্য উপহার দিল প্রায় একই মানের অতি উঁচু শিল্পের অসংখ্য 'ব্রোঞ্জের মূর্তি' — যা মিলে যয় রোমান শিল্প ঐতিহ্যের এক সমকক্ষ শিল্প সভ্যতার মানের সাথে। আজ ইউরোপের যাদুঘরগুলি ভরে যাচ্ছে, —লাইবেরিয়া, ঘানা, বেনিন, কঙ্গো আর আঙ্গোলার ভূমি-গর্ভ থেকে উদ্ধার করা অতি প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পন্ন শিল্প, — সেখানে স্বর্ণ, লৌহ, হস্তিদন্ত, তাম্র, টিন আর দস্তার ধাতুতে গড়া সব মূর্তিতে। তাদের সেই প্রাচীন গৌরবের দিনগুলি মনে করে কঙ্গোর বিখ্যাত কবি তাই লিখেছেন—

My race remembers
The taste of bronze drunk hot.

প্রাচীন ভারতের মন্ত্রোচ্চারণের মতোই— কোনো কাগজে-কলমে নয়। আফ্রিকার প্রাচীন কাব্য-শিল্পের কোনো বংশ পরম্পরা লিখিত প্রথার প্রচলন ছিল না। ফলে মাটির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, আফ্রিকার বহু কাব্যসম্পদ। কেবল, যে সব অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিঁটিয়ে ছড়িয়ে থাকা আদিবাসী গ্রাম-গঞ্জের মানুষ, যাঁরা আধুনিক সভ্যতার বাইরে গিয়ে

নিজেদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পেরেছিল, —তাদের কাছে আজও পাওয়া যায়— সেই সব প্রাচীন কাব্যগাথা, যা চলে এসেছে মুখে মুখে, এক বংশ থেকে অন্য বংশে। তার সন্ধান পাওয়া যায় — রুয়ান্ডা (Ruanda) অঞ্চলে, যেখানে এখনও বর্তমান 'বানিয়াগিন্যা' (Banyaginya)-র বংশধর, সেই ১১০০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত। এই বংশের জাতীয় কবিরা যুগের পর যুগ ধরে কতগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করে আসছেন। জনসাধারণের জন্য সেসব আইন-কানুন প্রয়োগবদ্ধ— সেসব এই কবিদের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়। কবিদের জন্য কোনও আয়করও নেই। কেউ যদি একটা ভাল কবিতা লিখতে পারে, এবং সেটা কবিকুলে গৃহীত হয় একবার, তবে সেই কবির চিরস্থায়ী আসন তৈরী হয়ে যায়— কবিসঙ্ঘে। তবে তাঁর প্রধান কাজই হবে, তাঁর পরবর্তী বংশধরের মুখে সেইসব কবিতা তুলে দিয়ে যাওয়া, যতে তাঁদের বংশধর আবার পরের বংশধরের কাছে এইসব কবিতা শিক্ষা দিয়ে যেতে পারে। এঁরা তখন সেইসব কবিতায় সুর বেঁধে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে সেইসব গান গেয়ে গেয়ে বেড়াবে, এবং তাদের প্রচার করে বেড়াবে। পরবর্তীকালে সম্রাট তার সভাসদদের প্রত্যেকটি কবি-পরিবারের একজনকে তাঁর সভায় স্থান করে দেন। তাঁর এইসব কবিরা বলতে গেলে সম্রাটের 'জীবন্ত লাইব্রেরী' এভাবেই এই 'বানিয়াগিন্যা' বংশে আজো ১৭৬ জনের জন্য কবিতাসমগ্র বর্তমান, এবং পরবর্তী কবির দল সংযোজিত হলে এমন একটা ব্যূহ তৈরী হবে যাঁদের এখনই বলা হচ্ছে— সেটাও আবার সরকারীভাবেই স্বীকৃতি ঘোষণায়— 'Heer der dynastischen Dichter' (বংশকবির সৈন্যদল) নাম দেওয়া হয়েছে।

আজকের আফ্রিকার কবিরা বুঝে গেছেন, কবিতায় তাঁদের ঐতিহ্যকে আর ধরে রাখা যাবে না। ইউরোপের ভাষায়, বিশেষ করে ফরাসী এবং ইংরেজী ভাষার মধ্যে তাদের ভাষা আস্তে আস্তে ডুবে যাবে। রাজ্য এবং জমি অধিগ্রহণ, খ্রিস্টবাদ আর উগ্র শিল্পায়নের ফলে ধীরে ধীরে তাদের সর্বপ্রকার ঐতিহ্যই হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের গ্রাস করে নিচ্ছে পশ্চিমী সভ্যতা। সমগ্র আফ্রিকায় তাদের মায়ের ভাষা ছিল ১০০০ (এক হাজার)-এর উপর। ক্রমশই তারা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয়বস্তু লক্ষ্য করার মতো:

এক, নিজেদের ভাষায় কবিতা লিখে, সেই ভাষায় বই ছাপাতে হলে, যে খরচ পড়ে, এবং সেই ভাষায় সেই বই বিক্রির সংখ্যা এত কম যে, কবির পক্ষে তার মাতৃভাষায় বই ছাপান বড্ড কঠিন হয়ে পড়ছে।

দুই, আজকের কোনও কবিই চান না তাঁর বই শুধু নিজস্ব শহরের বা গ্রামের পাঠকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাক— তিনি চান, তাঁর বইয়ের পাঠক সংখ্যা যেন ইউরোপ আমেরিকায় বেশি গড়ে ওঠে।

তিনি, তাই আজকের আফ্রিকান কবি, তাঁর বই ছাপাতে ইউরোপের ফরাসী বা ইংরেজী ভাষাকেই বেশি খুঁজতে থাকেন। তাঁদের সাক্ষাৎ মেলে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায়।

পৃথিবীর সব দেশের ক্রীতদাসদের সম্পর্কেই একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে— ''ক্রীতদাসের জন্য কান্নাই যথেষ্ট'' সেখানে, আমরা যদি ধরেই নিই, দীর্ঘ শতাব্দী ধরে পৃথিবীর মানুষ জানত, আফ্রিকান মানেই ক্রীতদাসদের বংশধর। ওরা জন্মায় ক্রীতদাস হবার জন্যই। আফ্রিকা মানেই, শুধু কালো, অন্ধকার, আদিম যুগের মানুষ — যেখানে সূর্যের আলো ঢোকে না, কেন না ঘন বনস্পতিতে ঘেরা এক বিচিত্র দেশ— যদিও ইন্দোনেশিয়া বা ব্রাজিলেও এমন ঘন বনস্পতি আরো বিস্তৃত দাপটে বিরাজ করছে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ কোনদিন তাদের আদিম ভাবেনি, সভ্যতার অন্ধকারে ডুবন্ত এক জাত হিসাবেও সেখানকার মানুষদের ভাবা হয়নি, অথচ নিজস্ব এক সভ্যতায় প্রাণবন্ত, —সঙ্গীত, শিল্প, চিত্রকলায় অত্যন্ত এক ঐশ্বর্য সম্পন্ন জাতিকে, তার বিশাল ভূখণ্ডের মানুষদের কেবল কালো বলে আদিম আর ক্রীতদাস আখ্যার নামাবলী গায়ে চড়িয়ে দিতে বাকী পৃথিবীর 'সভ্য' মানুষদের দ্বিধা বোধ হয়নি। আর এইসব 'ক্রীতদাস'দের কান্নার রূপান্তর ঘটে তাদেরই তুলনাহীন 'নৃত্যছন্দে' — যা এমনভাবে আর কোনও জাতির মধ্যেই দেখা যায় না। পুরীর সমুদ্র তীরের নুলিয়াদের বাচ্চারা যেমন হাঁটা শেখার আগেই সাঁতার শিখে ফেলে, তেমনি আফ্রিকানদের মধ্যে দেখা যায়— এদের শিশুরা প্রথম পা ফেলতে শেখে মা মাসি বোনেদের সাথে ঘুরে ঘুরে নাচের তালে তালে পা ফেলে, —তাদের মাঝখানে নাচের মধ্যমণি হয়ে। এভাবেই আমরা আফ্রিকার কবিদের কবিতায় আর চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবিতে দেখতে পাই, —নাচ, নাচের ছন্দ, যে ছন্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করা একেবারেই অসম্ভব। সে কথা আমরা জানতে পারি, জার্মান সমাজসেবী, শিল্প ও সাহিত্য প্রেমিক, রল্‌ফ্ ইটালিয়টানদের (ROLF ITALIAANDER) -এর চিত্র শিল্প সংগ্রহশালা আর তাদের প্রসঙ্গে নানা লেখা, থেকে — যিনি বহুবার পাড়ি দিয়েছেন আফ্রিকায়, বিশেষ করে কঙ্গো অঞ্চলে যেখানে সমাজ সেবায় জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, যাঁর দুর্লভ সংগ্রহ আমার এই অনুবাদের অনুপ্রেরণা। সেখানে বিস্ময়ে লক্ষ করতে হয়, আফ্রিকান কবিদের কবিতায় এবং শিল্পীদের আঁকা ছবিতে কেন এত বেশি 'ট্যাম্-ট্যাম্' নাচের ছন্দ, ছন্দের সাথে প্রকাশ, প্রকাশের সাথে বক্তব্য এসে যায়, এসে যায় পশুপাখিদের ভিড়, —তাদের সংসার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে দেহসঙ্গী হয়ে আছে গৃহপালিত জন্তুরা। গরু - ঘোড়া- ছাগল-হাতি তো আছেই, সেই সাথে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে বন্য জন্তুরাও। কবিতায় ও চিত্রশিল্পে যা ঘন ঘন এসে উপস্থিত হয়েছে। এই লেখায় যেসব ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে— বাধ্য হয়েই বিচিত্র সব রঙিন ছবি থেকে কালো-সাদায় সেইসব ছবি ছাপতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। রঙিন ছবি ভীষণ ভাবেই খরচ সাপেক্ষ।

এখন সারা পৃথিবী জুড়ে, বিশেষ করে দুই বাঙলায় চলেছে, বিশ্বকবিকে নিয়ে সার্ধশতবার্ষিকী জন্মোৎসব।

পশ্চিমবঙ্গ এখন সেই প্লাবনে ডুবুডুবু। তিনি আমাদের মহাকবি, ঋষি, প্রায় দেবতার মতো। শতবার নতমস্তকে তাঁকে প্রণাম জানিয়েও সামান্য একজন বাঙালি লেখকের পক্ষ থেকে তাঁকে সমালোচনা করা বা ভুল ধরার অধিকার কতটুকু আছে বা থাকতে পারে, সেটা মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্নটা আজ আফ্রিকার উপর কাজ করার অধিকারের দাবিতেই বার বার এসে পড়েছে।

তিরিশ দশকে হিটলারের উত্থানের ফলে নাৎসি জার্মানির পত্তন পাকাপাকি। পশ্চিমে জেগে উঠল যুদ্ধের দামামা। রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়ল বিশ্বব্যাপী একটা ধ্বংসযজ্ঞ, 'সভ্যতার সঙ্কট' মানবিক আবেদনে ডাক দিলেন বিশ্ববাসীকে। সেই সাথে তাঁকে ভীষণভাবে হয়ত নাড়া দিয়েছিল—আফ্রিকাও। হয়ত ইউরোপের সাথে আফ্রিকাকে মিশিয়ে ফেলে তিনি লিখে ফেললেন 'আফ্রিকা' কবিতাটি। ভাবাবেগের বাহুল্যে বিধৃত কবিতা, বাস্তবের আফ্রিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে সেইসময় কোনও মিল ছিল না, তার সামাজিক, গ্রামীণ ও লোকসভ্যতার আফ্রিকা, গান, সঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকশিল্প ও মৌখিক সাহিত্যের সাথে যার সম্পর্ক খুবই কম ছিল এবং শুধু আফ্রিকাকে তখন কেন্দ্র করে কেন - যে তিনি পশ্চিমের শক্তিধর 'সভ্যতার' দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে ধরেছিলেন, তা আমাদের তখন শিশু ও কিশোর বয়সে বুঝবার সুযোগ ছিল না। তার এক যুগ পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরেই, যখন আমরা কলেজে ঢুকলাম, তখন আমাদের কলেজ জীবনে বা পাড়ার বড় বড় 'ক্যালচারাল ফাংশানের'র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটা প্রধান বিষয়ই থাকত— 'আবৃত্তি'। পঞ্চাশ দশকে বেশিরভাগ 'আবৃত্তি অনুষ্ঠানে' এই 'আফ্রিকা' কবিতাটি প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর এই 'আফ্রিকা' কবিতাটি বার বার পড়তে পড়তে আর আবৃত্তি শুনতে শুনতে সেখানে কবিতাটি আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যা প্রায় বেদবাক্যসম, আমাদের 'ব্রেন-ওয়াশ' ভালভাবেই তখন হয়ে গিছেছিল। কবিতাটি সমাজ ও রাজনীতি সচেতন ছাত্র যুবকদের কছে তখন সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমীরাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা স্লোগানের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই 'আফ্রিকা' কবিতাটি যে একপেশে, সে ব্যাপারে সচেতন হবার সুযোগ ঘটল ষাট দশকের প্রথমে এসে যখন ছাত্র হিসাবে পশ্চিম বার্লিনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এত বড় একজন আফ্রিকান রাষ্ট্রনেতা 'লুমুম্বা'কে যখন হত্যা করা হল, তখন সারা বিশ্বে আফ্রিকা নিয়ে রাজনৈতিক বিশাল ঝড় উঠল। পশ্চিম বার্লিনে তখন বহু আফ্রিকান ছাত্র, তদের প্রচণ্ড ছাত্র আন্দোলন দেখলাম, ওদের মুখে মুখে এক নতুন আফ্রিকাকে আবিষ্কার করার সুযোগ ঘটল। ঘটনাচক্রে, প্রায় একটা একযুগ আমার ঘরের পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী হিসেবে পেয়েছিলাম আবার কয়েকজন রাজনীতি সচেতন সংগ্রামী আফ্রিকান ছাত্রদের। সত্তর দশকের প্রথম দিকে হাতে এসে গেল আরও একটা সুযোগ, একটা রিজিওনাল ফ্ল্যানিং-এর প্রোজেক্ট, 'লাইবেরিয়ান' -এর উপর, সেখানে আমরা চারজন— একজন লাইবেরিয়ার, দুইজন জার্মান এবং আমি একজন ভারতীয়। তখনই হাতে এল—আফ্রিকার উপর অনেক মূল্যবান তথ্য— রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক। কবিগুরুর 'আফ্রিকা' প্রসঙ্গ আমাকে এখান টানতে হচ্ছে এই জন্যে, —আফ্রিকার উপর কাজ করতে গিয়ে বার বার মানসিকভাবে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল— এই 'আফ্রিকা' কবিতাটি বাস্তবের আফ্রিকার সাথে যার কোনও সম্পর্কই ছিল না। ছিল শুধু একটা ভারতীয় বাস্তবতা শূন্য আদর্শে আপ্লুত মানবতার বাণীর ভাবাবেগের আতিশয্য! এবং সেটা কেন ঘটেছিল, সেটাই বার বার প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল।

বর্তমান বাঙালির চরিত্রের দিকে আরও একটু বলতে হয় এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবার্ষিকী জন্মোৎসবের মহান ব্রতের একটানা অবিরাম বৃষ্টিপাতের মতো যে মহোৎসব চলেছে, তাতে লক্ষ করার মতো, একদল দক্ষ সাহিত্য - সংস্কৃতির নিপুণ কারিগর আমাদের এই বিশ্বকবি মহান ব্যক্তিকে, যিনি আমাদের এই মানুষের ধরাতলের একজন মহামানব মানুষ, তাঁকে প্রায় আকাশের এই ঈশ্বর তৈরীর কজে উঠে পড়ে লেগে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই লেখকের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা এবং জীবিকা সন্ধানের তাগিদে বহু জাতির মাঝে বসবাস করার সময় তাদের বহুমুখী যুক্তি ও চৈতন্য বোধের সথে পরিচয় ঘটার সুযোগ ঘটেছে। কোথাও দেখা যায়নি ভারতবর্ষের মতো আত্মউদ্ধারের নামে এত ঘন ঘন ভগবান সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও প্রচার। প্রায় একশত বছর পূর্বে মানব সমাজের মুক্তির প্রতিভূ ইউরোপে কার্ল মার্কস সাহেব বুঝে ফেলেছিলেন, পৃথিবীর বিপ্লবীরা তাঁকে বেধহয় এবার ভগবান বানাবার তালে আছে। সেই আতঙ্কেই হয়তো —শোনা যায় তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন 'ভগবানকে ধন্যবাদ আমি মার্কসিস্ট নই'। অথচ বাস্তবতার কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন—, এই পৃথিবীর শোষক ও শোষিত, বর্তমানে প্রথম বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র এবং সাদা ও কালো মানুষদের মধ্যে যে প্রভেদ ও বিভেদ, — তদের সব সমস্যাও সংঘাত সভ্যতার পৃথিবী হোক, বা কবিতার কঙ্গোই হোক, আজ মানুষের সমবন্টিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে — অন্য এক বিবর্তিত গণতান্ত্রিক সাম্যবাদের মধ্য দিয়ে, তথাকথিত কোনো মানবতাবাদের মধ্য দিয়ে নয়। দৃষ্টান্ত— জার্মানির গ্রীন পার্টির জয় - জয়কার, উত্তর আফ্রিকান দেশগুলির, তথা মধ্যপ্রাচ্যের জ্বলন্ত উত্থান।

অন্যদিকে আমেরিকা বর্তমান রাজনৈতিক ঝড়ের একটা প্রধান বিষয় হচ্ছে— রিপাব্লিকানদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ওবামা। তাদের জেহাদ ধনতন্ত্রী আমেরিকাতে কিছুতেই সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া হবে না। কার্ল মার্কসের ভূত এখন তাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

আজ আফ্রিকার জল-স্থল-নদীগর্ভ আর বন-সম্পদের সব ঐশ্বর্যকে লুটপাট করার জন্য চীন থেকে আরম্ভ করে

পৃথিবীর সব ধনী দেশ সেখানে নেমে পড়েছে। তাই আফ্রিকার মুক্তি কোনও ভাবাবেগ বা তথাকথিত মানবতার বাণীতে হবে না। — হবে, একদিন শুধুই সমাজতন্ত্রবাদের মধ্য দিয়ে। কবিতাও আজ তাই ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস নয়, যুক্তির আবেগ।

সেই আফ্রিকার একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লাইবেরিয়া (LIBERIA)-র উপর রিজিওনাল প্ল্যানিং এর একটা প্রোজেক্ট করতে গিয়ে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, কিশোর বয়সে একটা ব্রেনওয়াশে'র ফলে কতদূর গড়াতে পারে। লাইবেরিয়া প্রসঙ্গ সেখান বাস্তব ও নিষ্ঠুর ছিল। —এখানে কঙ্গো থেকে খুব একটা দূরে নয়। লাইবেরিয়ার একজন কবির একটা কবিতা অনূদিত হলে এখানে খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না।

একটি জঙ্গল-সঙ্গীত

ব্যে টি মূর (BAY T. MOORE)

অনেক দূরের ওপর থেকে
পদধ্বনি গানে গানে
চারিদিকে ঘন উৎসব প্রেমের জঙ্গল।
সেখানে এক গায়ক বুঝি বলছে তার গানের তাল:
জীবন ছন্দ পায়ে তালে,
কী মনোরম যাদুর ছোঁয়ায়
নাচের ছন্দে ষোড়শীদের ধিতাং ধিতাং বোল—
ডবকা বুকের স্তনের দোলায়
হায় হায় হায় — কী যাদু যে নাচে!
এবার বুঝি কালো - কালো - চামড়া - মরদগুলি
পাথর - পেশীর দল
লুটিয়ে পড়ে মহানন্দে
জঙ্গলময় মজার ভালবাসায়—
লুটছে তারা যে-যার প্রেম
নিজের মতো করে।

[ব্যে টি. মূরের জন্ম ১৯১৬ সালে। লাইবেরিয়ায়। পেশায় শিক্ষকতা। কৃষিদর্শন আর গ্রাম দিগন্তের UNESCO-র একজন অধিকর্তা হিসাবেও অনেকদিন কাজ করেছেন। উপরের এই কবিতাটি তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'A Golah Boy in America' থেকে নেওয়া।]

আজকের আফ্রিকান কবিদের বুঝতে গেলে, চলে যেতে হবে তাদের পুরাতন ঐতিহ্যের গভীর থেকে যে রক্তপ্রবাহ ওদের শরীরে বইছে সেই স্রোতের গভীরে — একদিকে কঙ্গো নদীর স্রোত, অন্যদিকে তাদের জীবন ও বিশ্বদর্শন সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস ভূত, প্রেত, আর কুসংস্কারের সাথে প্রাচীন প্রচলিত মূর্তি, দেবতা থেকে আরম্ভ করে প্রেতাত্মাদের জন্য ভজন ভাবনা প্রার্থনার তত্ত্বে। তাদের মূল দর্শন, এই বিশ্বের সর্বত্র যত প্রকারের শক্তি কাজ করে, তার মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ শক্তি। যেমন বান্টু দর্শন। একদিকে 'শূন্য' অন্যদিকে 'মানুষ'। Bantu দর্শনের এই 'শূন্য' বিস্ময়তায় একটা বিশেষ উপলব্ধি আফ্রিকানদের মধ্যে প্রবল বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করে, সেটা হচ্ছে : জীবনে আতঙ্কের কোনও স্থান নেই। মৃত্যুর পরেও মৃতেরা বেঁচে থাকে। তাদের জীবনীশক্তির যদিও ঘাটতি পড়ে— তবুও জীবিতদের মধ্যে সেইসব আত্মার একটা ভূমিকা থাকে— নতুন প্রজন্মের জীবনে সেইসব জীবিত আত্মা আলাদা করে একটা বাড়তি শক্তি প্রদান করতে পারে।

এছাড়া বিখ্যাত জার্মান আফ্রিকাবিদ্ ইয়ানহাইনৎস্ ইয়ান (Janheinz Jahn)-এর গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে : 'Jahn has argued in 'Muntu' that the genius of African poetry is collective **:**

In African poetry...The expresion is always in the service the content; it is never a question of expressin 'one self', by of expressing 'something'...Nor is the African poet ever concerned with his inner nature, with his individuality.'